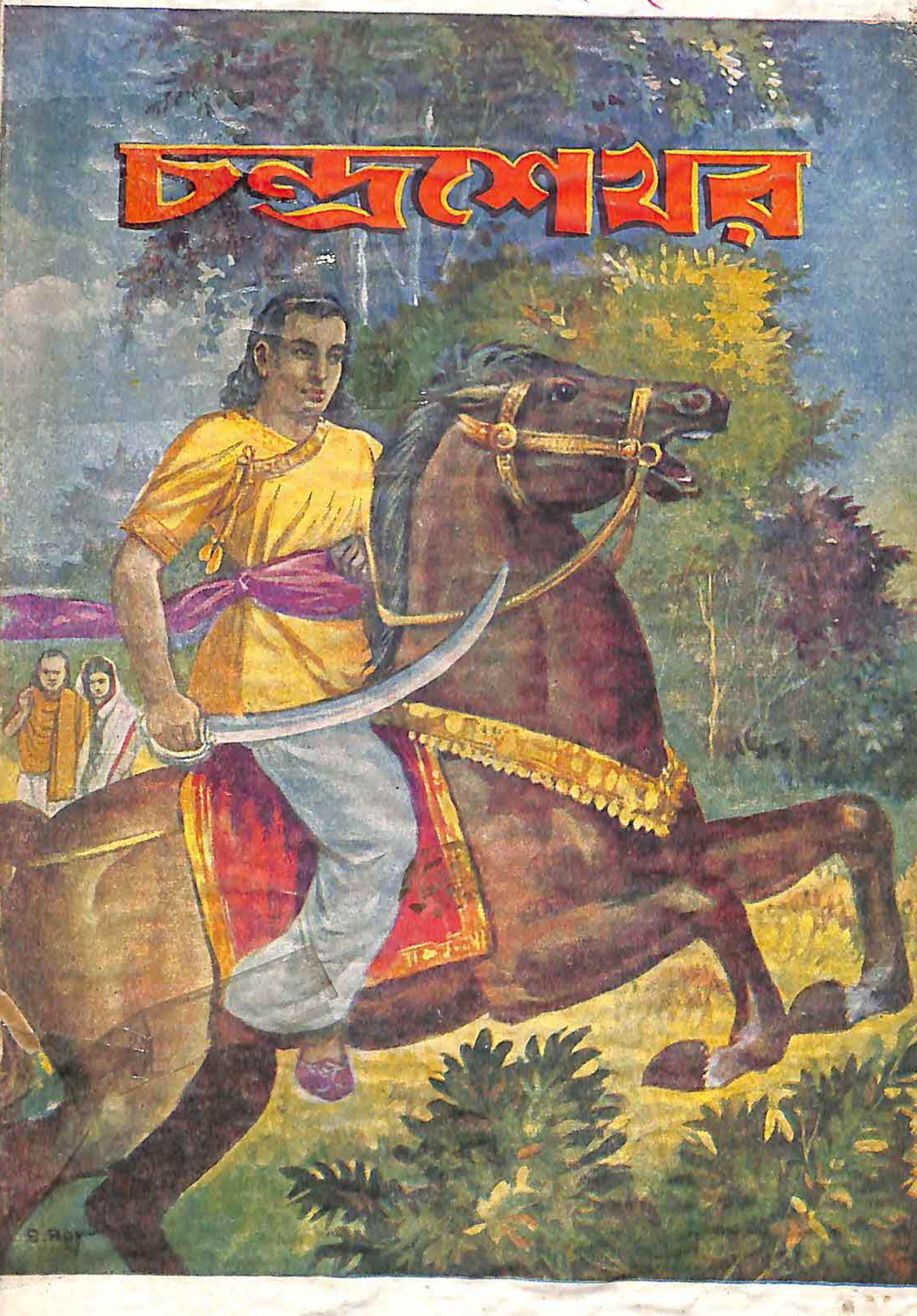

চন্দ্রশেখর

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর
এবং বিহার রাজ্যের জন্য অনুমোদিত

বঙ্কিম-গ্রন্থমালার'র ৫নং গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের



চন্দ্রশেখর

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

CHANDRASHEKHAR
CODE NO. 4-64-009

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
১৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার



সম্পাদকের ভূমিকা

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা-সাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। এই কাহিনীর পিছনে যে ইতিহাসের কথা আছে, তাহা অবান্তর। শুধু কাঠামো মাত্র। আসল হইল, চন্দ্রশেখরের জীবনকে লইয়া সামাজিক কাহিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে একটি বড় আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া আছে। শুধু কাহিনী বলার জন্য তিনি কাহিনী লেখেন নাই। জগতে যত কাব্য বা উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহার মূল কথা হইল—ভালবাসা। এই ভালবাসা লইয়া কত সাহিত্যিক, কত-ভাবে কত কাহিনী লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর সেখানে একটি অপূর্ব্ব নূতন চরিত্র। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আমাদের ঋষিরা ভালবাসাকে যেভাবে দেখিয়াছেন, চন্দ্রশেখর-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সংযমকে সব-চেয়ে বড় উঁচু জায়গা দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রশেখর-চরিত্রে এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন, নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কালেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাথামাথি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম

সম্বন্ধে উদাসীন,……বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাঁহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব জন্মদাতা…সাহিত্যিক গুরু তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালক-বালিকা

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য-জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত-আট বছরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর-তর রব সে ব্যঙ্গ-সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া বালকের গলায় পরাইল; আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা-পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর-একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তারপর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ-জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল।

গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, "আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।"

দুইজনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া-দুলিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, ছুটিয়া-ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল।

সাঁতার দিতে-দিতে ইহারা অনেক দূরে গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেইসময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্সী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন।

তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তাহার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িলেন না, চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে, পতিত হইয়া, সেদিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ-পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেব-সেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়,—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন-কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।

এই বিবাহের আট বৎসর পর এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

———

প্রথম খণ্ড

পাপীয়সী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে, একস্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই।

গৃহমধ্যে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। এমন সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকাইয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও—আমি শুনিব।"

তখন মহাগোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরাজেরা যে-বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে-পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি সে-সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীর কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের

সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন ?"

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব, তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই ? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন ? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদের হইয়া প্রজা-পীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব ? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি !"

দলনী বলিল, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব ? কিন্তু, আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীর-কা। এ-বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে ? না, বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ-বিষয়ে পরামর্শ দেয় ?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ-সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি ?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ?"

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও ?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।"

মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন, কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা ! আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময়ে কোথায় থাকিব ?"

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন।

দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন ?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীর মুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে, বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে—দলনী বেগম কোথায় থাকিবে ?

মীর মুন্সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালো জলে পড়িয়াছে ; কালো জলে রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কালো ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সেই আবৃত অল্পান্ধকার মধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

সুন্দরী বলিল,"ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ী যাই।"

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্যি-সত্যি তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি ?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিলেন না। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষ তলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া, কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিলেন না—তুলিলেন না—জল হইতে উঠিলেন না।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তাল-গাছের অন্তরালে-অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "I come again."

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

ইংরেজ। হম্ again আয়া হ্যায়।

শৈ। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায় ?"

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে ?

ইংরেজ। যম! John you mean ? হম্ জন্ নহি, হম্—লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম ; লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর মৃৎপ্রদীপ-সম্মুখে তুলটে হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতেছিলেন।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত—তদুপরি চন্দন-রেখা। শৈবলিনী গৃহ-প্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব ?" কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আজ এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন ?"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।"

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে নাকি ? বিলম্ব হইল কেন ?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী-ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায়



...সুন্দরী কহিল, "আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব।"

ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না।" এই বলিয়া আবার শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীর হইল। তখনও চন্দ্রশেখর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। শৈবলিনী প্রথামত, স্বামীর অন্নব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া আপনি আহারাদি করিয়া, পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চন্দ্রশেখর বিদ্যালোচনা করিতে করিতে আহার করিতেই ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সম্বাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর, বা কুঠিয়াল।

একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে শৈবলিনী তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইলেন না—তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিলেন। তাহাও পাঠক জানেন।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।"

যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

ফষ্টর শৈবলিনীর কথা ভাবিয়া, যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সে রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সেদিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজ-কর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন —অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই।

গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাতেরা একে-একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে—পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব। দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, দ্রব্যসামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই।

কেহ-কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীর মধ্যে সে গিয়াছে।" যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শেষে বসিল, বসিয়া-বসিয়া নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল, ঢুলিয়া-ঢুলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিলেন না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই

সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী ; শৈবলিনীর সখী।

সুন্দরী বসিয়া-বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাপিতানি

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাসদাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না ; রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙাপেড়ে শাড়ী-পরা—হাতে আলতার চুপড়ী। রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া দাসী, নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"নাপিতানী, তুমি কাঁদছ ?"

নাপিতানী মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ, কাঁদছ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া

দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি আসতে মাত্র চিনেছি। তা এখানে এলি কোথা হতে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী-ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও। আমার এই শাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আলতার চুপড়ী নাও! ঘোমটা দিয়া, নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাই ত এর পর দিব। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গি একটু দূরে রাখিয়া আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আলতার চুপড়ী নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে-তীরে যাইবে। ডিঙ্গিতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না— ডিঙ্গিতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গি খুলিয়া দিয়া তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, তোমার দশা?"

সু। আমার জন্যে ভাবিও না। তুমি যাও, যে-প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিলেন। একটু কাঁদিলেন, চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি যাইব—আমার স্বামীও হয়ত আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখনও ঘুচিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে

কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। দেখি রাজধানীতে ভিক্ষা মেলে কিনা। মরিতে হয় না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না, মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।"

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল; বলিল, 'ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, আলতার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন; দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয় আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে, দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। কোনদিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে, ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে-স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে-স্থানে কবাট ভাঙ্গা।

তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি !"

কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত-তরণীর উপর ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গাহিতেছিল।

* * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার প্রিয় গ্রন্থগুলি একে-একে আনিয়া একত্র করিলেন। সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশিকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে-ক্রমে সকলই জ্বলিয়া উঠিল ; সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুল্‌সম্‌

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল।"

দলনী বেগম্‌, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল।

নিকটে এক পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্‌।"

কুল্‌সম্‌ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার-বোঝাই দুইখানি কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়নদার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, 'নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে!' গুর্‌গন্‌ খাঁ বলেন, 'লড়াই বাধে বাধুক, নৌকা ছাড়িব না'।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমাবাদের (পাটনা) কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা, গুর্‌গন্‌ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে।

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল। পরে কহিল, "কুল্‌সম্‌, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করিতে পারিস্‌?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর! তামাসা নহে। একবার গুর্‌গন্‌ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্‌ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটি যাইয়া আপন-আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষী আহারে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্ বলিল, "কাজ অতি সামান্য, একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ-কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমার কর্ম্ম তুমি জান, আমি দাসী, পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা—দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুর্‌গন্ খাঁ

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুর্‌গন্ খাঁ।

এই সময় বাঙ্গালায় যে-সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গন্ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমাণি, ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল-মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গন্ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া গুর্‌গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গন্ খাঁ বলিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপদার কহিল, "আছে।"

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে

বাধা দিবে না, বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?

চোপ্‌দার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্। আচ্ছা তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গন্ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে-মনে বলিতে লাগিলেন—"এখন মীর কাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেইজন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীর কাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?"

বলিতে বলিতে যাঁহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গন্ খাঁ কহিলেন, "তুমি এ দুঃসাহসিক কাজ কেন করিলে? নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে—আমাকে—দুইজনকে বধ করিবেন!"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমত ভরসা করিতেছ! এতদিন আমরা এ-সম্বন্ধে প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ-কথা কি সত্য?

গুর্। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার-আমার ক্ষতি কি? হয়, হউক না।

দ। আমার মনে হইতেছে যে, কোনমতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে

যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ-যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ-যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া, দলনী বেগম রোদন করিতে লাগিল।

গুর্‌গন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীর কাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে বলিল, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাসেম আমার স্বামী? অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। যদি তুমি এ যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ!" এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেল।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গন্ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীর কাসেমের হইয়াছে। অতএত আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্‌গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাঁহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল, দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিল, তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনীর চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল, বলিল, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও, গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে আমার স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলনীর কি হইল

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। নাহয় মরিব, ক্ষতি কি?

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি আশ্রয়বৃক্ষের অভিমুখে আসিতেছে।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল, বলিল, "এখানে তোমরা কে?"

দীর্ঘাকার পুরুষটির কণ্ঠস্বর অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকদিগের ভয় দূর হইল। কুল্‌সম্ বলিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?"

পু। এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন; এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল।

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিল। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিল। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিল।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।"

দলনী। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন। লিপি সমাপ্ত হইলে দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি-বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে-সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত; সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী

সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।"

মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোনপ্রকারে অদ্য কালযাপন কর।"

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এইস্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তারপর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তারপর কিছুদিন অমনি-অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীকন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিত। তাহার স্বামী শ্রীনাথও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। সুন্দরীর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম—রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব, তাহার বিষয়ে আমি বড় কু-স্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার কথায় সম্মত হইলেন।

সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেল—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ। শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে,

প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাশেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন-দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশ-বিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিল, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি, শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিল। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এতদিন আমাকে এ-কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন? আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।"

এই বলিয়া প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গেলেন, রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম—রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না!"

যে-গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক, সেইজন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিসকে কোনপ্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ-সকল বৃত্তান্তের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গেরে আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুর্‌গন্ খাঁ নৌকা আটক করিলেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড় —আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত-পঞ্চাশ

দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন 'তেলিঙ্গা' নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড়-বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুমদার ?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়াছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড়-বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল, বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, নৌকার লোকেরা জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড়-বনের দিকে অল্প ধূম-রেখা দেখিলেন।

কসাড়-বনের উপর ধূম-রেখা দেখিয়া ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন সময়ে কসাড়-বনের ভিতর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, আবার বন্দুকের শব্দ হইল —ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।



...তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে অমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল।

প্রতাপ সেইসময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজরার বন্ধন-রজ্জু সকল কাটিলেন এবং লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিয়া দেখিল, প্রতাপের কৌশলে নৌকা বাহির-জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল, আর কেহ অগ্রসর হইল না। প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর-একজন তেলিঙ্গা-সিপাহী নৌকার ছাদের উপর বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন ; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়, নবাবও আমাকে ভয় করেন ; এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ি—বোধহয়, তোমাদের কয়জনকে একলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকে কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর সকলে যেখানে যে আছ—সেইখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়-সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল।

তখন ভড় হইতে জনকয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গীতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুইজন লোক আহত হইল, অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড়-বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং

সিপাহীগণ কসাড়-বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত

সেই তরণীমধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর-একটিতে শৈবলিনী এবং তাঁহার দাসী পার্ব্বতী। প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিলেন। অসম্পূর্ণ ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিলেন না। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

শৈবলিনী বলিলেন, "একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারিদণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের কি কপাল, ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া এক চরে লাগিল। পরে, তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া

প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে—কোথায় যাইব ?"

রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে রামচরণের সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন ; রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না, উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল। প্রতাপের সেইরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাল্কী জগৎ শেঠের গৃহে লইয়া যাইও। রামচরণ পথে ভাবিল—"এত রাত্রে জগৎ শেঠের ফটক খোলা পাইব কিনা ? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কিনা ? জিজ্ঞাসা করিলে কি পরিচয় দিব ? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব ? সে সকলে কাজ নাই ; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নিজগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন।

প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়ন-কক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন,

পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "একি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থির হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনা বাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী। আমাকে এখানে কে আনিল?

প্র। আমরা আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত

হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে ?”

শৈবলিনী বিনীতভাবে বলিলেন, “যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন ? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।”

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তাও করিতাম—কেবল স্ত্রী-হত্যার ভয়ে করি নাই ; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।”

এই বলিয়াই প্রতাপ সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা-সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়া ছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে-পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে সেই পথে চলিল। অতি দূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম, বকাউল্লা খাঁ।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে-সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল,

তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল—বলিল যে, “আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।”

আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিন-চারিজন সিপাহী এবং একজন নায়েককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন, “দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।”

বকাউল্লা বলিল, “তবে দুইজন ইংরেজ সঙ্গে দিউন। প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এদেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।”

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন। গমনকালে গল্‌ষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি সেই বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়েছিলে?”

বকাউল্লা বলিল, “না।”

গল্‌ষ্টন্ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, “তবে বাতি ও দেশলাই লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।”

জন্‌সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণযাত্রার গভীর পদ-বিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চারিজন সিপাহী, নায়েক ও বকাউল্লা চলিল।

নগরপ্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া ধীরে-ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিতহস্ত। কিন্তু এ-সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ-প্রদেশে প্রসিদ্ধ। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ-সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, “এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে?

একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি, রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।”

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল দুইজনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃতভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে ইণ্ডিল-মিণ্ডিল বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, “রসো বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল-মিণ্ডিলকে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।”

রামচরণ আরও ভাবিল, ‘বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।’ এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এইসময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্সন্ বলিলেন, “অপেক্ষা কেন, লাথি মার। ভারতবর্ষীয়-কবাট ইংরেজি-লাথিতে টিকিবে না।”

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিলেন। দ্বার খড়-খড়, ছড়-ছড়, ঝন-ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপানে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্সন্ লাথি মারিলেন। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

“এইরূপে ব্রিটিশ-পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক” বলিয়া ইংরেজরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি-চুপি প্রতাপকে বলিল, “অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আমবাতের কুঠি থেকে।” রামচরণ, আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আটজন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্‌ জ্বালিত বর্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্‌ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই ?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল। সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন-হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে-কেহ তাহার দায়ে-দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্‌ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ চরণে আহত হইল, চলিবার শক্তিরহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ? কেন আসিয়াছ ?"

গল্‌ষ্টন্‌ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে-নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপর বন্দুক-হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জনাব এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্‌ প্রতাপের এক হাত ধরিলেন, গল্‌ষ্টন্‌ আর-এক হাত ধরিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নায়েকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্‌ পতিত রামচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওটা ?"

জন্‌সন্‌ দুইজন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকেও লইয়া আইস।" দুইজন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এইসকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্‌ জাগ্রত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া এইসকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজরা প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক অকস্মাৎ দ্বারপথে দলনীর চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে-চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!"

গল্‌ষ্টন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জনসন্‌ ও গল্‌ষ্টন্‌ ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্‌ মহাভীতা হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলিল।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিলেন। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাপের বিচিত্র গতি

সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভাবিলেন, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই, মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ্‌ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই-বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কই, একদিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না।

মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না। কিন্তু, আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে, প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না।"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল।

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। "মরিব? না, আজ নহে। মরি ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব।"

শৈবলিনী শয়ন করিলেন। প্রভাতকালে তাঁহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন—চন্দ্রশেখর!

তৃতীয় খণ্ড

পুণ্যের স্পর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে, একজন পরমহংস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শনবিজ্ঞান সকলই তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন বৎস চন্দ্রশেখর! যে-সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর, কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেননা, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ-দুঃখতুল্য যা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নল রাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানব-পীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই। তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ করিতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক-দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব-সুখ। নচেৎ দেবতার

অন্য সুখ নাই।” পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া—ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার সুকণ্ঠ-নির্গত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল—কখনও মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখনও বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, “গুরুদেব! আজ হইতে আমি আপনার নিকট এ-মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।”

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে, ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছে। তাহাকে ও কুল্‌সম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে-গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিলেন, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী আপত্তি না করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন।

খোজা শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন ?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন ?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়।

যখন গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের বাসা হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা কে, তাহা জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকে ইংরেজরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিলেন।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে ?

শৈ। প্রতাপ রায়ের বাসায় ?

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান ?

শৈ। দুইজন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব, গুর্‌গন্‌ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজ কেন বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান ?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল ?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেইসঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল ?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে জান ?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিলেন, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "না।"

ন। প্রতাপ কে ? তাহার বাড়ী কোথায় ?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিলেন।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল ?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয় ?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি ?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিলেন। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমার গৃহ কোথায়—কোথায় যাইব ?"

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন, পরক্ষণে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে ?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব, সেইজন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুরগন্ খাঁ হাজির। নবাব শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন সখ

নবাব গুর্‌গন্‌ খাঁকে অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায়, বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল?"

গুর্‌গন্‌ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে।—আর—"

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই শহরমধ্যে এক ব্যক্তির গৃহে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্‌। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু, তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্‌। তাহারা এ শহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্‌। এত্তেলা দিবার জন্যে 'হে' নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্যে হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্‌। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়নদার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেইজন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে, শুনিয়াছ?

গুর্‌। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে, খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্ । তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন?

গুর্ । আমি এইমাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্গন্ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্গন্ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয় আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব, গুর্গন্ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গন্ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই— "যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তারপর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, "মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরোয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া, কলে-কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দাও।"

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে, ধরা যায় না কি?"

নবাব। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা

মুরশিদাবাদ পৌঁছিবে। বিশেষ, যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে; মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে-কৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিলেন যে, নবাব তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাতজোড় করিলেন। বলিলেন, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা—মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ —তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে, তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না; তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না; যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন, "প্রভু! না পারি, আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত-ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই, নইলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধ করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী আর একজন রক্ষক আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দীন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং

সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও এবং একজন হিন্দু-বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে ?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া-দেখিয়া সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও। কখন যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীর কাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিলেন।

মসীবুদ্দীন, পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারী ও ছুরি সংগ্রহ করিল।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবল শ্রী ধরিয়াছে ; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘন শ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতিজ্ঞানে কখন-কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত,

যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত। তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে বালুকাভূমে তরণী-শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণী-শ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীরা পাহারা। সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্ত্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। একজন পড়িতেছেন; একজন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে-দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলাভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ-ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমের মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তর-মধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃপুনঃ তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্‌ও প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ-মহলে হিন্দীতে তাঁহার বড় পশার। গল্‌ষ্টন্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়?"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না—কাঁদিতে লাগিলেন।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

গল্‌ষ্টন্‌ হার মানিলেন। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে-কথাও বুঝিলেন না—নড়িলেন না—দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙালীর মেয়ে। একজন বাঙালীকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙালী-মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিলেন। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চ্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। শৈবলিনী কিছুই খাইলেন না। খানসামা বলিল, "খাও না?"

শৈবলিনী বলিলেন, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ-কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে, দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা যে-নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ-কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ-কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে-পিছে শান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ও গো ঠাকুর! তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?"

প্রতাপ বলিলেন, "কেন?"

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে, দুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা শান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। শান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল।

আমিয়ট জমাদার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। শান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া, প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছেন, মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিলেন, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে-কানে বলিলেন, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইলেন। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে-কানে বলিলেন, "এখন পালাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "আগে তুমি যাও। নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এইবেলা পালাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এইবেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল, আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে-করিতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে —আমার জাত গেল—মা গঙ্গা, ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে-করিতে নৌকা হইতে বাহির হইলেন। শান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া

দেখিতেছ ?” এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। “স্ত্রীলোককে রক্ষা কর” বলিয়া প্রতাপ অপরদিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে-আগে সাঁতার দিয়া চলিলেন। প্রতাপ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

“কয়েদী ভাগিল” বলিয়া পশ্চাতের শান্ত্রী ডাকিল এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, “ভয় নাই—পালাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রী-হত্যা কি-প্রকারে দেখিব ? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।”

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিলেন। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে, যে-নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিত হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাহার ছাদে জ্যোৎস্নার আলোকে ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় রহিয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিলেন, দেখিলেন—পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। চীৎকার করিয়া বলিল, “পাক্ড়ো। পাক্ড়ো। হামারা বিবি।” ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি-পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “পাক্ড়ো! পাক্ড়ো! ফষ্টর সাহেব ইনাম দেগা!”

প্রতাপ মনে-মনে বলিলেন, “ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম

দিয়াছি—ইচ্ছা আছে, আর একবার দিব।” প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।”

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে সাঁতার

দুইজনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেলেন। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিলেন। কিন্তু শ্রান্তি নাই, উভয়ে সন্তরণপটু।

প্রতাপ ডাকিলেন,—“শৈবলিনী—শৈ!”

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিলেন,—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ ‘শৈ’ বলিয়া ডাকিতেন। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিলেন। কত কাল পরে! শৈবলিনী চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, “প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?”

প্রতাপ বলিলেন, “চাঁদের? না সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই, কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।”

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ! মনে পড়ে? আর একদিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিলেন না। একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, শৈবলিনী তাহা ধরিলেন; প্রতাপকে বলিলেন, “ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।” প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিলেন; বলিলেন, “মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?”

শৈ। মনে পড়ে।

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন, “কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।

প্র। আমি উঠিব না, আজি মরিব। প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িলেন।

শৈ। কেন, প্রতাপ? কি চাও? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ, প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল! চন্দ্র কপিশবর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারিহস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "কি শপথ, প্রতাপ?"

প্রতাপ নিকটে গিয়া, শৈবলিনীর হাত ধরিলেন। দুইজনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিলেন।

শৈবলিনী বলিলেন, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—"

প্রতাপ। শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিলেন। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িলেন। শৈবলিনী আবার ধরিলেন। তখন অতি গম্ভীর স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিলেন—বলিলেন,—"প্রতাপ, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়! শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিলেন—কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন।

প্রতাপ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিলেন।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিলেন। ছিপ নিকটে ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহ জানিতেন না যে, রমানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল; কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইলেন, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলীতে যে ফষ্টরের আঘাত ও শান্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা-কালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মনিব বড় বদজাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে, আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি একপ্রকার খোসামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোসামোদ করিয়া "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোসামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি ?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক !"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কিছুদিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব !"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে-রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। গমন-কালে রামচরণ অস্ফুষ্টস্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে-বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ ছিদ্রশূন্য, অনন্ত-বিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূম্রবর্ণ ; তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার, গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার, তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে ; সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে ছিপ তীরে লাগিয়াছিল—বড়-বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেইসময়ে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিলেন। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করেন নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ-সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই। আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে ?

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। মনে তাঁহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাঁহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই তাঁহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিলেন, ততদূর চলিলেন। ভারতবর্ষের কটিবন্ধ-স্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইলেন। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি-আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে গেল, সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি-আরোহণ আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারে শিলাখণ্ডসকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতা-গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে, ভগ্নশাখাগ্রভাগে হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া এ ভীষণ কণ্টকময় হিংস্রজন্তু-পরিবৃত পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এতকাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে ?

অতএব ক্ষতবিক্ষত-চরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত

পিপাসা-পীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ নাই—শৈবলিনী বহুকষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিলেন।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী-তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী সকল ঢাকিয়া ফেলিল। শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা। শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিলেন।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে-সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল।

শৈবলিনী বুঝিলেন, বিষম নৈদাঘ বাত্যা প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি ? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না ?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। একবিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের ; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ-শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত-মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিলেন যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ, অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গার্হস্থ্যসুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর-একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃপুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমত সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য

পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে সেই মহাঘোর অন্ধকারে কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিলেন, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিলেন। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্য-হস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কে? দেবতা, না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিলেন যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাঁহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাস-স্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিলেন। দেখিলেন, এক হস্ত শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিলেন, তাঁহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিলেন—বুঝিলেন যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাঁহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিলেন যে, এ যেই হউক, লরেন্স-ফষ্টর নহে।

———

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু! আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তিরক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে-রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন, সেই রাত্রি-প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছেন। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাঁহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ-সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ-জাতি বাঙলায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িতেন না। অতএব ইংরেজ-জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে

হইবে ; দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ-জাতিকে বাঙলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি অসুরদিগকে বাঙলা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না ? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না ?

তারপর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এই কার্য্যে নবাবের সাহায্য করা। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না ? আমি কি করিতে পারি ?

তারপর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে —দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে ?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুটপাট হইতে পারে! যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্যসামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ-সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ-বিনাশের সামান্য উপায়-মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যতদূর পারি, ততদূর তাহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোসামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশ আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রূপসী দুঃখিতা হইলেন।



—নবাব কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে
স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন।...

প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সুন্দরীও শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন।

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে-দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছেন।

শুনিয়া গুরগন্‌-খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—উপল-শয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ! নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনিই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্র-পথে বিন্দু-বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে-ক্ষণে টিপ্‌টাপ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙিয়া পড়িল, মন ভাঙিয়া পড়িল —শৈবলিনী। অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রদবস্থায় রহিলেন।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে শৈবলিনী দেখিলেন, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ নৃমুণ্ড,

কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল—চর্ম্ম মাংসাদিবর্জ্জিত—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিলেন যে, যে মহাকায় পুরুষ তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আবার ধৃত করিয়া তাঁহাকে সেই নদীতীরে আসিয়া বসাইলেন। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই, অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায় প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্।"

শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি-প্রকারে সাঁতার দিবেন? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিলেন যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিলেন। অমনি কুম্ভীরসকল তাঁহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিলেন; মহাকায় পুরুষ তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে রুধির স্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইলেন। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার

ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “রক্ষা কর! এ নরক। এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?”

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, “আছে।”

স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিলেন, “আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?”

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, “আছে।”

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য-সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি উপায়?”

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, “দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।”

এ কি, দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, “কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?”

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈব। তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈব। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইলেন। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি করিব?”

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈব। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর। হ্যাঁ, গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করিবে।

শৈব। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈব। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈব। আর?

উত্তর। জটাধারণ করিবে।

শৈব। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে-গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈব। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈব। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈব। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইলেন না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যেই হউন জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর-একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?

উত্তর—কেন?

শৈব। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈব। দ্বাদশ বৎসর পরে?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈব। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কতদিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈব। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র

এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ দিন-রাত কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও ; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না, বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া সরলচিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিলেন—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইলেন না—কেবল একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইতেন। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিলেন না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিছু দেখিতে পান না, কিছু শুনিতে পান না, কিছু স্পর্শ করিতে পান না। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পান না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিলেন।

যে-বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে-করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামীধ্যান কর, সে অনন্ত মানব-হৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চির-প্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিলেন।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি

অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফলমূল খাইলেন না—ষষ্ঠ দিবসে ফলমূল আহরণে গেলেন না—সপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিলেন, স্বামী-দর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিলেন, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন, শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুন্-গুন্ করিতেছেন।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে-করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইলেন। তিনি নানা বিষয়ে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইলেন। তাহার পরেই তাঁহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল; তখন তিনি মনে-মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিলেন—"কোথায় তুমি স্বামি! কোথায় প্রভু! আমি নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন হও—আমায় রক্ষা কর।"

তখন অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনা-প্রাপ্ত হইলেন।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাত-কূজন শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল এ প্রভাতান্ধকারে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন,—চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারিবেশে চন্দ্রশেখর!

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী !"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিলেন, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিলেন, মাথা ঘুরিল, শৈবলিনী পড়িয়া গেলেন ; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিলেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে-কাঁদিতে চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃ পতিত হইয়া বলিলেন, "এখন আমার দশা কি হইবে ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন ?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিলেন, রোদন সম্বরণ করিলেন—স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"অল্পদিন বাঁচিব, মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? কেন বিশ্বাস করিবে ? যে স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি ?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিলেন।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈব। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ; ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া মৃদুমধুর-স্বরে বলিলেন,—"শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে

বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।”

শৈবলিনী হাত যোড় করিলেন,—বলিলেন “আর একবার বসো। বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।” আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল —“বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।”

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?” শৈবলিনী স্থির দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিলেন। বলিলেন, “মরিতে পারিব না, সেই নরকে পড়িব।”

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈব। এই মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রি-দিন নরক-স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে —যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি দেখিতেছ?”

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন ভয় পাইতেছ?”

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“প্রভু, রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?”

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন, উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। শৈবলিনী উঠিয়া বসিলেন। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈব। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণপরে বলিলেন, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে, মরিলেই নরকে যাইব, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে এ-সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিলেন,—চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন।

তখন চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া, গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেচন করাতে এবং অনাবৃত স্থানে অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিলেন—বলিলেন, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিলেন—আবার ভীতা হইলেন। বলিলেন, "তুমি কে?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা-হা করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—

"তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে-দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী আবার হাসিলেন, বলিলেন, "শৈবলিনী কে? রসো, রসো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল—মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলে ফেলল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হ্যাঁ গা সাহেব। তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

"আমি চন্দ্রশেখর।"

সহসা শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইলেন—কোন কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—কত কাঁদিলেন—তাঁহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমাকে মারিবে না ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণ বদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন—কখন হাসিতে লাগিলেন—কখন কাঁদিতে লাগিলেন—কখন গাহিতে লাগিলেন।

———

পঞ্চম খণ্ড

প্রচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সংবাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন ; কিন্তু প্রফুল্ল মনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি দূরে অলক্ষিত-রূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কিনা। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, "যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার-ব্যবহার কি ?" আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম্ বন্দী-স্বরূপে সংরক্ষিত ছিল, সে-নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্ কানে-কানে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্‌সম্, শুনিতেছ ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন ?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্ না ; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজ ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে ?

দ। নহে কেন ? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ কি ?

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও, আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতেপারিস্ ?"

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছি। মুঙ্গেরে যেমন হে-সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে-সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে-সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে ; নইলে ভয় কি ?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে-সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না, ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না ?"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলেক রিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মনে হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্সন্ বলিলেন—"এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকটে নৌকা লইয়া গেলে হয় না ?"

অমিয়টা বলিলেন, "যেদিন একজন ইংরেজ, দেশী লোকের ভয়ে

পলাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব, সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শস্ত্রহস্তে মারিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও এবং দুইজন সিপাহী সঙ্গে দাও, বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্‌ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুইজন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টরের নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ-সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া, একটি ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে বন্দুকের দশবারোটা শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলী বর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে-স্থানে নৌকার ভিতর গুলী প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয়পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থূল পড়িল।

তখন মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল।

মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে এক-এক জনে এক-এক জনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহারা যুঝিতে পারিলেন না।

মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিনজন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন।

তখন আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলো মুসলমান মুদগরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কল-কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন ? বাহিরে আইস ; বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারিহস্তে তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত শত্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন পাঠান, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন ? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজ এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইবে ; আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে, তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল ; দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন্ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ-বারজন পাঠান গল্‌ষ্টন্‌কে ঘিরিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং অচিরাৎ বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপরে শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সেই

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল পাছে মুসলমান গিয়া

রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এস্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সেদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে-কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, শত্রুর নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোনমতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য মুসলমানেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু-পাছু আসিতেছে দেখিতেছ ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল ? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল।

দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে-কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না ? তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

তখন দলনী বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা-শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্। তুমি বাঁচিলে ত?

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফষ্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু-পিছু আইসে। তুমিও নাম।"

কুল্‌সম বলিল, "যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল, যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা, সেই সন্দেহে দলনী অঞ্চল ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না, বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ-নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম। অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত



...চন্দ্রশেখর প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন...

হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে-কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূর দৌড়াইয়াও নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না। তখন হতাশ হইয়া দলনী সেখানে বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভ মধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই-একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোনদিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোনদিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল-কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কল-নাদিনী নদীপ্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছেন। এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

আবার সেই। এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৃত্য-গীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাব চন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দীপরশ্মি উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে, শেঠদিগের কণ্ঠ-বিলম্বিত মুক্তাহারে, আর—নর্ত্তকীর কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল।

উজ্জ্বল মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না, তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্‌গন্ খাঁ।

বাঙলা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান-সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পাটনাস্থিত মুসলমান-সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজরা মুসলমানদিগের হাতে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দীভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয়পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গন্ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য-গীত উপলক্ষমাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না।

গুর্‌গন্ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয়-পক্ষে বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে তিনি উভয়পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙলার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ-সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গন্ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে-পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে-মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন ; কেন না, তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দীস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গ-মধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ-পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই ; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীর কাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্‌গন্ খাঁ দেখা-সাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া গুর্‌গন্ এবং অন্যান্য রাজঅমাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্‌গন্ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন ; এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক্ আসনে বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্যস্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুর্‌গন্ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন ?"

মাহতাব চন্দ। কি মতলব ?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গন্ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকা আপনাদিগের দিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

মাহ। আমরা রাজি আছি।

কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গন্‌ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন ?"

মাহ। না—কোথায় ?

গুর্‌। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ। নাম কি ?

গুর্‌। প্রতাপ রায়।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—কেন সে হঠাৎ এ-প্রকার করিতেছে ?

গুর্‌। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। সে কিসের বশ ?

গুর্‌। কেন সে এ কার্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ ? জমি-জমা তালুক মুলুকও দিতে পারি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দলনী কি করিল

মহাকায় পুরুষ নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিলেন। দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিলেন।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর-এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে-কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে

কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মসনদে বসাইবেন। যদি ইংরেজরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীর কাসেম এ-প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না! আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীর কাসেম জয়ী হয়েন তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথা-পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হুজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী, খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্গণের নিকট বাস করিব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।' এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

যে মুহূর্ত্তে অশ্বারোহী দূত যাত্রা করিল সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর

রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ প্রথম কথা কহিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিলেন, "তোমায় চিনি, তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

আগন্তুক বলিলেন, "এক্ষণে তুমি কোথা যাইবে?"

দলনী বলিল, "যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর।"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিত হইল, বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদে যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল।

ষষ্ঠ খণ্ড

সিদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে রমানন্দ স্বামী যখন নবদ্বীপে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সেইসময় নদী-পথে তাঁহারা শৈবলিনীর নৌকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। এবং উভয়ে শৈবলিনীর গতিবিধির উপর গোপনে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। রাত্রিপ্রভাতে তাঁহারা যখন দেখিলেন, শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেলেন, তখন উভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাহার পর অন্ধকার গুহামধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠক জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে-গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইঁহাকে রাখিও।"

গুরুর আদেশমত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীর কাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীর কাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি

জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীর কাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে, সেইখানে বিষ পান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "এ কি খাঁ সাহেব! আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিল, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিল, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দলনী পরওয়ানা পড়িয়া হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। বলিল, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন। তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?"

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন, সেইজন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল, "কেন লিখিয়াছিলে?"

মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিল, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

দলনী দেখিল, যথার্থ বটে, জাল নহে।—"কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "আপনি বিষপান করিবেন নাকি?"

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা

হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিল, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

তকি বলিল, "আমাকে তুমি বিবাহ কর—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে,—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিল।

মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না—দলনীর প্রতি চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—"বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ? বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না। তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষ পান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

করিমন্ নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমন ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

করিমন্ প্রথমে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সংবাদ দিল,—"করিমন্ বাঁদী আজ এইমাত্র হকিম মেরজা হবীরের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমন্‌কে ধরিল, করিমন্ স্বীকার করিল। বলিল, “বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।”

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিল। দেখিল, দলনী আসনে উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধদৃষ্টিতে যুক্তকরে বসিয়া আছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিল, “এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?”

দলনী বলিল, “ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি-- প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।”

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে ধীরে শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট ও বরাট

মীর কাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছিল। ভাঙা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙিল—আবার মুসলমান সেনা, ইংরেজের বাহুবলে তাড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুষ্পার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া মুসলমানেরা ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিল।

মীর কাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন একদা জানাইলেন যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর।

মীর কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কে?”

আমীর হোসেন বলিলেন, “একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া

দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে।” এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখিয়াছিলেন, “এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না। সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভালমন্দ কিছু জানি না।”

নবাব পত্র শুনিয়া স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, “তুই কি চাহিস্ বাঁদী—মরিবি?”

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, “নবাব! আপনার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!”

মীর কাসেম বলিলেন, “যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও শীঘ্রই সেইখানে যাইবে।”

কুল্‌সম্ বলিল, “আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?”

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি।—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল —তখন কুল্‌সম্ বলিতে লগিল, “আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এখনই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না, এই সময় শুনুন।

হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবী এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্ ষ্ট্যাল্‌কার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্যসকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে কার্য্যচ্যুত করেন।

ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে পূর্ব্ব প্রভুদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস বা জার্ম্মাণ, মীর কাসেমের সেনাদলের মধ্যে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্তমন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ষ্ট্যাল্‌কার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন কুল্‌সমকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান-সৈন্যভুক্ত

হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে, সমরু জন্ ষ্ট্যাল্কার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যাল্কার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যাল্কার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল, "নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন ষ্ট্যাল্কার্ট আর ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

আমীর হোসেন বিদায় লইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন, তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।"

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখন সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান

"শুনুন, সুবে বাঙলা-বেহারের মীর কাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন্ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "গুর্‌গন্ খাঁ ও দৌলত উন্নেচ্ছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকাণ্বেষণে বাঙলায় আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে—যে-রাত্রে তাহারা দুইজনে গুর্‌গন্ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্‌বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে যে-সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন, আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণ কৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনী ভ্রমে দলনীকে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টর কৃত পরিত্যাগ। এ-সকল বলিয়া শেষ বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে-সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব?" এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনের উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব—অধোবদনে। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্ সত্যই বলিয়াছে—বাঙলার নবাব মূর্খ।

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাংলার নবাব মূর্খ! তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি ফকিরী গ্রহণ করিব।"—বলিতে-বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন, বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া

ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর, আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—আলি ইব্রাহিম খাঁ ?"

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস !"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে ?"

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার ?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে ? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে ?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এতদিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।"

তাহার পর নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী বেগমকে মুঙ্গেরে আশ্রয়-দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার ?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌, বলিল, "হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্‌গন্ খাঁ কতদূর ?" অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পেঁৗছেন নাই।"

নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ ! কাহার ফৌজ !"

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি !"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার

করিল। আমীর হোসেন আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্‌ আসিল; ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।"

সমরুর সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার বেদগ্রাম

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশবাখারী পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর হাত ধরিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, কক্ষদ্বারে বসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী, শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছেন তবু শৈবলিনী সরিলেন না, ঘোমটাও টানিলেন না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন।

সুন্দরী নিকটে আসিলে, তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তারপরে পাতার কোল ভিজা-ভিজা হইয়া উঠিল, শেষে জল-বিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে-ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল,—ধীরে-ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে-ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিলেন না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিলেন না।

সুন্দরী প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইল; পরে সেই ভগ্নগৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল-সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে দেবগ্রামে আসিলেন।

সেইদিন রমানন্দ স্বামীও সেইস্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদসহকারে সুন্দরী শুনিল যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর ঔষধ-প্রয়োগ করিবেন! ঔষধ প্রয়োগের শুভলগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগবল না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী মৃদু-মৃদু গীত গাহিতে লাগিলেন—উঠিলেন না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে-ধীরে গণ্ডূষ-গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন; রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জল মাত্র; কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাঁহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানাপ্রকার বক্রগতিতে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িলেন—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী নিদ্রাবস্থায় বলিলেন, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে ?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিলেন, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে ?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান ?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে-কে আছে ?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে ফষ্টরের সঙ্গে গিয়াছিলে কেন ?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতাপ তোমার কে ? তাহার জন্য গৃহত্যাগ করিলে কেন ?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, একবনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন ?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেদিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সেদিনে গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে ?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি-কি কথা হইয়াছিল ?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন ?"

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাসমাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী ?

শৈ। প্রতাপকে মনে-মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এ জন্য আমি সাধ্বী নহি—মহা পাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে ?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন ?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কিনা। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন; ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন ?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

চ। এ-সকল কথা কে জানে ?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্বতী কোথায় ?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায় ?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতীকার হইবে—বুঝিতে পার ?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর ?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন ?

শৈ। এ-সংসারে আমার স্থান কোথায় ?

চ। কেন, আমার গৃহে ?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন ?

চ। যদি করি ?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি ; কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ, —বল, ও কিসের শব্দ ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে ?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে ?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে ?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ আসিলে, প্রতাপ তাহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুইজনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে উচ্চাসনে নবাব কাসেম আলি খাঁ দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া, জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইর্‌ফান বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।"

নবাব প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিল যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিল, 'এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।"

"আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব। তুমি কোন জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম, তুমি ভয়শূন্য—সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল, বাঁদী কুল্‌সম্‌ কোথায়?

কুল্‌সম্‌ও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী?

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্‌, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিল, কোন্‌ পক্ষে যাই, এইজন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে-চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্‌ বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে।"

কুল্‌সম্‌ আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে এই পাপিষ্ঠ স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে— জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুলসম্‌ বিস্ফারিতলোচনে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ, আমার সাক্ষী—জগদীশ্বর। আপনার বুকের উপর হাত দে, আমার সাক্ষী—তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর্‌।"

নবাব। কেমন ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা-যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী!"

কুল্‌সম্ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই-একটা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ, চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল, "আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না!"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইলেন। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা—গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের দৃষ্টি! ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি-প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন। আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অন্যপ্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ-দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিংবদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে, তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুর দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে। কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যু বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া ভূমে বসিয়া যুক্তকরে উর্দ্ধ-নয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ, তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজ আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী রক্তবস্ত্র-পরিহিত পুরুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল! ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন! ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলেই শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল—"তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন ?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে ; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুইজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ-কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে ?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন, বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই, সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত ?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই খাইত না।

প্রশ্ন। জল ?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমন সময়ে সহসা শব্দ হইল, "ধুরূম্, ধুরূম্, ধুম্ ধুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও ?"

ইর্ফান্ কাতরস্বরে বলিল, "আর কি ? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্," আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল। রণবাদ্য বাজিল, চারিদিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝন্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল। ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইল—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ ও ভৃত্যগণ ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর—ইহারাও বাহির হইল। তাম্বু মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্র

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি-প্রকারে? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হইতেছে। চারিদিকে ধূমে অন্ধকার, কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই—যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজজাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি; বোধহয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল, আমরা পলায়ন-পরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তোমার-আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিনজনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে তাহাদিগের নায়ক,

অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, সে প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের!"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি!" এই বলিয়া প্রতাপ তিনজনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট—দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ! তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; চন্দ্রশেখর বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব; কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ-পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিলেন—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিলেন—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্যস্বরে প্রতাপকে বলিলেন, "আমার একটা কথা কানে-কানে শুনিবে? আমি দূষণীয় কিছু বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য-সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ, এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব। কিন্তু তোমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

প্র। কি করিতে চাও ?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন ; বলিলেন, "বলিও, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী ?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল।

গমন কালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও ?"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না, যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম !"

চন্দ্রশেখর দ্রুতপদে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বলগা ধরিলেন। বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই ? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ড-বিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা ? যে অধম, সে-ই শত্রুর প্রতি হিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখনও লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন ?"

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। তুই একদিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইতেছি।"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপীকৃত হইয়াছে —কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল ! জল !" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেইসকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে ?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় ?"

সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের

মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনই আশীর্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে?"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ-সংসারে তুমিই যথার্থ পর-হিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না— তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ

জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে-শিরে, শোণিতে-শোণিতে, অস্থিতে-অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। যখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ-জন্মে এ-অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ-দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আপনি এই গুপ্ততত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ-প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন—"তাহা আমি জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে-ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, আনন্দজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময়লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

সমাপ্ত